প্রকৃতির পরাজয়

আবদুর রশিদ, বি. এ., বি. টি.,
ডিপ্লোমা ইন্ এডুকেশন (লিড্‌স)

প্রকাশক
বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড সন্স্‌ লিঃ
স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী
৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ;
৩৮নং জনসন রোড, ঢাকা।

১৩৪৯

মূল্য দশ আনা

মুদ্রাকর
শ্রীত্রৈলোক্যচন্দ্র সুর
আশুতোষ প্রেস, ঢাকা।

উপহার

প্রকৃতির পরাজয়

লিসেপ্‌সের প্রস্তর-মূর্ত্তি —পৃঃ ১৪

সূচনা

মানুষ যখন অসভ্য ছিল, তখন সে ছিল প্রকৃতির কৃপার পাত্র ; কিন্তু এখন সে প্রকৃতিকেই বশে আনিয়া তাহাকে নানা কাজে খাটাইতেছে এবং প্রাকৃতিক বাধাসমূহ অতিক্রম করিয়া সর্ব্বত্র যাতায়াতের ব্যবস্থা করিয়া লইতেছে। ফলে, মানুষ এখন "জলে স্থলে আর গগনে গগনে" নির্ভয়ে অবলীলাক্রমে ভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছে। প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্য মানুষ কত আয়োজন, কত চেষ্টা যে করিয়াছে, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। খাল কাটিয়া, সুড়ঙ্গ খুঁড়িয়া, সেতু বাঁধিয়া, গমনাগমনের সময় সংক্ষেপ করিয়া লওয়া সেই সকল প্রচেষ্টারই সামান্য পরিচয় মাত্র।

প্রকৃতির পরাজয়

বুদ্ধির বলে যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া, উহার সাহায্যে মানুষ আজ অসীম আকাশের গ্রহনক্ষত্রদের সহিত পরিচয় ঘটাইয়াছে এবং অতলের রহস্য ভেদ করিয়া কত অজানাকে জানিয়াছে !

প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্য মানুষের এই যে আজন্ম চেষ্টা,—এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহারই সামান্য আভাস দেওয়া হইল।

সুয়েজ খাল

সুয়েজ খালের নাম শোনে নাই এমন কেহ তোমাদের মধ্যে আছে কি না জানি না। তবে এ-কথা হয় ত সত্য যে, এখালের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিবার সুযোগ তোমাদের অনেকেরই হয় নাই। কখন, কি ভাবে এবং কাহারা এই খাল খনন করিয়া জগতে অমর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, সেই কথাই আজ তোমাদিগকে বলিব।

এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ দুইটিকে সংযুক্ত করিয়া বর্ত্তমান ছিল সংকীর্ণ সুয়েজ যোজক। উহার উত্তর প্রান্তে ভূমধ্যসাগর ও দক্ষিণ প্রান্তে লোহিত সাগর। উভয় সাগরের মধ্যে ব্যবধান এক শত

মাইলেরও কম। এই সামান্য ভূখণ্ড মাঝখানে থাকায় জলপথে ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষের দিকে আসিতে হইত আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরিয়া। ইহাতে অর্থ ও পরিশ্রম ব্যতীত সময়ও লাগিত যথেষ্ট। তাই চেষ্টা চলিতে লাগিল, সুয়েজ যোজককে খালে পরিণত করিয়া উহার ভিতর দিয়া জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করা যায় কি না!

খ্রীষ্টের জন্মের বহুশত বৎসর পূর্ব্বে মিশরের 'ফেরোয়া' উপাধিধারী সম্রাটেরা খাল কাটাইয়া নীলনদের সহিত লোহিত সাগরের সংযোগ সাধনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। নীলনদ পড়িতেছে ভূমধ্য-সাগরে; সুতারং এই খাল দ্বারা লোহিত সাগরের সহিত ভূমধ্যসাগরের সংযোগ সাধিত হইয়াছিল, বুঝিতে পারা যায়।

মুসলমানেরা মিশর দখল করিয়া এই খালের জন্য অর্থ-ব্যয় করিয়াছিলেন। পরে অষ্টম শতাব্দীতে খালটা কিছু অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে। তাহার

সাত-আট শত বৎসর পরে, উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কৃত হইলে, ভেনিস্ নগরের নাবিকেরা স্থয়েজ যোজককে প্রণালীতে পরিণত করিতে প্রয়াসী হ'ন। পরে তুরস্কের স্থলতান এবং মহাবীর নেপোলিয়নও এবিষয়ে মনোযোগী হইয়াছিলেন। নেপোলিয়নের সৈন্যগণ যখন মিশর অধিকার করে, তখন তাহাদের সঙ্গে বিজ্ঞানবিদ্ ইন্‌জিনিয়ারও আসিয়াছিলেন। নেপো-লিয়ন ভারতবর্ষের সহিত ফ্রান্সের ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপনের ইচ্ছায় এই খাল কাটাইতে উৎসাহী হ'ন। তিনি ইন্‌জিনিয়ারদিগকে স্থয়েজ যোজক জরীপ করিতে আদেশ দিলেন. এবং কিরূপে খাল খনন করা যায় তাহার একটি খসড়া বিবরণ প্রস্তুত করিতে বলিলেন; কিন্তু তাঁহারা জরীপে ভুল করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—এই খাল কাটা সম্ভবপর হইবে না, কারণ লোহিত সাগরের তলদেশ ভূমধ্যসাগরের তলদেশ অপেক্ষা প্রায় ৩৬ ফুট উচ্চতর। নেপো-

লিয়ন বাধ্য হইয়া খাল কাটাইবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন।

নেপোলিয়নের খাল সংক্রান্ত কাগজপত্র ফ্রান্সের সরকারী দপ্তরখানায় রক্ষিত ছিল। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের একজন যুবক ইন্‌জিনিয়ার ঐ সকল কাগজপত্র পাঠ করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, সুয়েজ যোজকের ভিতর দিয়া খাল কাটান মোটেই অসম্ভব নহে। এদিকে নূতন নূতন গণনার ফলে পুরাতন গণনায় ভুল বাহির হইল, কাজেই খাল খনন ব্যাপারে নানা দিক্ হইতেই নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইতে লাগিল।

মিশরের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা মোহাম্মদ সৈয়দ খাল কর্ত্তনে বিশেষ উৎসাহী হইলেন; কিন্তু এইরূপ বিরাট ব্যাপারে একাকী হস্তক্ষেপ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইল না। তাই ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকেরা অংশীদার হইয়া একটি যৌথ কারবারের সৃষ্টি করিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে 'সুয়েজ খাল

কোম্পানী' গঠিত হয় এবং ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সেই ফরাসী ইন্‌জিনিয়ারের তত্ত্বাবধানে খননকার্য্য আরম্ভ হয়। এই কর্ম্মবীর প্রতিভাবান্ ইন্‌জিনিয়ারের নাম ফার্ডিনাণ্ড-ডি-লিসেপ্‌স্। পঁচিশ হাজার মজুর দশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া খাল-খনন সম্পূর্ণ করে। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে এই খাল ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এই কাজে যত টাকা ব্যয় হইয়াছিল মিশরের শাসনকর্ত্তা নিজেই তাহার অর্দ্ধেকেরও অধিক টাকার অংশীদার ছিলেন। পরে তিনি ইংরাজদের নিকট নিজের সমস্ত অংশ বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে একটি ব্যবসায়ী-মণ্ডলী এই খালের মালিক ও পরিচালক। এই ব্যবসায়ী-মণ্ডলীর নাম "সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানী"।

পৃথিবীর যে কোন জাতির পণ্যবাহী অথবা যাত্রিবাহী জাহাজ এই খালের ভিতর দিয়া বিনা বাধায় যাতায়াত করিতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক জাহাজকেই যাত্রী-পিছু অথবা মালের জন্য মণ-পিছু

নির্দ্ধারিত শুল্ক দিতে হয়। ইহাতে যে আয় হয়, তাহার কতকাংশ খাল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয়িত হয়, বাকী অংশ কোম্পানীর নিয়মানুসারে অংশীদারগণের মধ্যে লভ্যরূপে বিতরিত হইয়া থাকে। রেল কোম্পানীকে যেমন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নানা শ্রেণীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত রাখিতে হয়, ক্যানাল কোম্পানীকেও খাল রক্ষার জন্য সেইরূপ নানা শ্রেণীর কর্ম্মচারী রাখিতে হয়। খালের দুই দিকেই বিস্তীর্ণ মরুভূমি। মরুভূমি হইতে বালুকা উড়িয়া আসিয়া সর্ব্বক্ষণই খালের মধ্যে পড়িতেছে। কাজেই ড্রেজার যন্ত্রের সাহায্যে খালের তলদেশ হইতে বালু তুলিবার আয়োজন দিনরাত চলিতেছে। কয়েক বৎসর হইল বালুকা হইতে খালকে রক্ষা করিবার জন্য নূতন উপায় অবলম্বনের চেষ্টা চলিতেছে। এই উদ্দেশ্যে খালের পশ্চিম তীরে অর্থাৎ মিশরের দিকে চাষ-আবাদ সুরু হইয়াছে এবং বৃক্ষাদি রোপণের চেষ্টা হইতেছে। পার্শ্ববর্ত্তী বালুকাভূমিকে সাধারণ শক্ত

মৃত্তিকায় পরিণত করিতে পারিলে বালু উড়িয়া আসিয়া খালে পড়িবার সম্ভাবনা কমিবে; কিন্তু মরুভূমির মধ্যে বাগান তৈরি করা অথবা কৃষিকর্ম্ম করা অতি কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার।

সুয়েজ খালের পরিসর ২৬০´ ফুট হইতে ৪৪৫´ ফুটের মধ্যে। কাজেই স্থানে স্থানে ইহার বিস্তার কালীঘাটের গঙ্গার সমান হইবে। একসঙ্গে দুইখানা জাহাজ কষ্টেসৃষ্টে চলিতে পারিলেও চলিবার হুকুম নাই। মাঝে মাঝে বিস্তৃততর স্থান আছে; সেখানে আসিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের সঙ্কেত মত উল্টাদিকের জাহাজের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। পুনরায় সঙ্কেত পাইলে জাহাজ চলিতে আরম্ভ করে। খালের তলদেশ ও দুই কিনারা সাধারণ চৌবাচ্চার মত পাথর দিয়া বাঁধান। খালের সকল স্থানেই গভীরতা ২৬´ ফুট। লোহিত সাগরের দিকে খালের মুখে সুয়েজ বন্দর, আর ভূমধ্যসাগরের তীরে পোর্ট সৈয়দ। উভয়স্থানের মধ্যে দূরত্ব অর্থাৎ সম্পূর্ণ

খালের দৈর্ঘ্য ৮৮ মাইল। সমুদ্রগামী সাধারণ জাহাজের গতিবেগ ঘণ্টায় ১৫ হইতে ২০ মাইল। কিন্তু খালের ভিতর দিয়া চলিবার কালে ঘণ্টায় ৬ মাইলের বেশি কোন জাহাজকে যাইতে দেওয়া হয় না। তবে, মধ্যে মধ্যে সাগরতুল্য কয়েকটি হ্রদ আছে, সেই সকল স্থানে অধিকতর বেগে যাওয়া যায়। সমস্ত খাল অতিক্রম করিতে ১২ হইতে ১৫ ঘণ্টা সময় লাগিয়া থাকে।

লোহিত সাগর হইতে সুয়েজ খালে প্রবেশ করিবার কালে যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক প্রস্তর-নির্ম্মিত স্মৃতিস্তম্ভ। এই স্তম্ভটি খালের মুখ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত। বিগত মহাযুদ্ধে যে সকল ভারতীয় সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, তাহাদের স্মৃতিরক্ষার্থে এই স্তম্ভটি নির্ম্মিত হইয়াছে। খালের মুখের বাম পার্শ্বে অর্থাৎ আফ্রিকার দিকে সুয়েজ বন্দর ও নগর। বন্দর ও সহরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে দুই মাইল দীর্ঘ পাথরের পুল

দ্বীপের মত দেখা যায়—ইহার উপর দিয়া রেলপথ প্রস্তুত হইয়াছে। যাত্রী-জাহাজ সাধারণতঃ সুয়েজ বন্দরে থামে না।

খাল দিয়া উত্তরদিকে যাইতে প্রথমে পড়ে 'ছোট তিক্ত হ্রদ' (small bitter lake), তৎপর ইহারই সহিত সংযুক্ত 'বড় তিক্ত হ্রদ' (great bitter lake). বড় তিক্ত হ্রদটি বাস্তবিকই ছোট-খাট একটি সমুদ্রের ন্যায়। আরও কিছুদূর উত্তরে গেলে, খালের প্রায় মধ্যভাগে, তিমৃশাহ হ্রদ। এই হ্রদের পশ্চিম তীরে ইস্‌মাইলিয়া সহর বেশ উন্নতিশীল। এখান হইতে প্রায় ৫০ মাইল গমন করিলে খালের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ পোর্ট সৈয়দ বন্দর দেখিতে পাওয়া যায়। খাল খননের সঙ্গে সঙ্গেই এই বন্দরের সৃষ্টি হয় এবং মিশরের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ পাশার নামানুসারে ইহার নাম রাখা হয়। সৈয়দ বন্দর খালের পশ্চিম তীরে—ইহার বিপরীত দিকে নূতন নগর পোর্ট ফোয়াদ। মিশরের ভূতপূর্ব্ব

রাজা ফোয়াদের নামে ইহার নামকরণ করা হইয়াছে।

পোর্ট সৈয়দে প্রায় সকল জাহাজই থামে। যাত্রীরা ইচ্ছা করিলে তীরে নামিয়া দুই-এক ঘণ্টার জন্য সহর ঘূরিয়া আসিতে পারে। খালের তীরবর্ত্তী ক্যানাল কোম্পানীর সুদৃশ্য আফিস একটি দেখিবার জিনিস।

বন্দরের উত্তর প্রান্তে—খাল হইতে ভূমধ্য-সাগরে পড়িবার পথে—বামদিকে লিসেপ্‌সের সুউচ্চ প্রস্তর-মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। সমুদ্রের ভিতর অনেকদূর চলিয়া গেলেও এই মূর্ত্তি যাত্রীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া যেন বলিতে থাকে,—“জগতে চেষ্টার অসাধ্য কর্ম্ম নাই।”

অতলের রহস্য-ভেদ

এমন একদিন গিয়াছে, যখন মানুষ তাহাদের আশেপাশের স্থানটুকুর বাহিরে কি আছে তাহা একেবারেই জানিত না। কালক্রমে নানা কারণে পরিচিত স্থানের সীমা ছাড়াইয়া তাহাদিগকে দূরদেশে যাইতে হইল। ইহাতে দেশ-বিদেশের সঙ্গে তাহাদের পরিচয় হইল; আর হইল তাহাদের এই জ্ঞান যে, এতটুকু সামান্য স্থানেই পৃথিবী সীমাবদ্ধ নহে। কিন্তু শুধু পৃথিবীর বিশালত্ব আর নানা দেশের বিবরণ জানিয়াই মানুষ ক্ষান্ত হইল না। তাহাদের কেহ কেহ ভাবিল, 'আকাশের তারা আর সমুদ্দুরের বালি—গুণে করব কালি।' আকাশে কত তারা

আছে এবং সমুদ্রেই বা কত বালুকণা আছে, মানুষ তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে অবশ্য পারে নাই—কোনো দিন পারিবেও না ; কিন্তু মানুষের চেষ্টার ফলে নক্ষত্রমণ্ডলের বহু বিচিত্র কাহিনী আমরা জানিতে পারিয়াছি এবং মহাসিন্ধুর অনন্ত নীল জলরাশির তলদেশে কি আছে, সে কথাও আমরা বলিতে পারি। পাতালপুরীর রহস্য আমাদের কাছে কেমন করিয়া উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধেই আজ তোমাদিগকে কয়েকটি কথা বলিব।

সমুদ্রে মাছ আছে, কুমীর আছে, হাঙ্গর আছে, তিমি আছে এবং আরও হাজার হাজার রকমের ছোট-বড় প্রাণী আছে—একথা লোকে বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই জানিত ; কিন্তু সকলেই মনে করিত—সমুদ্রের প্রাণীরা জলের নীচে মাত্র কয়েক শত ফুট পর্য্যন্তই যাতায়াত করে, বেশি দূর নীচে গিয়া তাহারা বাঁচিতে পারে না। সাগরের একেবারে তলায় অর্থাৎ হাজার হাজার ফুট জলের নীচে

কোনো প্রকার জীবের অস্তিত্ব যে থাকিতে পারে, পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে একথা কেউ ভাবিতেই পারিত না। পৃথিবী হইতে লক্ষ লক্ষ মাইল ঊর্দ্ধে,—যেখানে সশরীরে পৌঁছিবার কল্পনাও মানুষ করিতে পারে না, সেই মহাশূন্যে ভাসমান জ্যোতিষ্কদের সম্বন্ধে কত তথ্য মানুষ প্রাচীনকাল হইতেই সংগ্রহ করিয়া আসিতেছে। সেই জন্যই জ্যোতিঃশাস্ত্র এত পুরাতন। আর যে-সমুদ্রের উপর দিয়া মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া আসা-যাওয়া করিতেছে, তাহার সম্বন্ধে মানুষের সম্যক্ জ্ঞানলাভ হইল মাত্র সেদিন!

সমুদ্রের তলা ও তাহার গভীরতম প্রদেশের বিষয় বিশেষ করিয়া জানিবার সুযোগ এবং আবশ্যকতা হইল সমুদ্রের ভিতর দিয়া টেলিগ্রাফের তার (cable) বসাইতে গিয়া এবং বসাইবার পর হইতে। ভূমধ্যসাগরের মধ্যদিয়া যে তার গিয়াছে, মেরামতের দরকার হওয়ায় উহার এক অংশ এক সময়ে জলের উপরে তোলা হয়। টেলিগ্রাফের তার যে-পাইপের

ভিতরে থাকে, দেখা গেল, সেই পাইপের গায়ে কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র জীব জড়াইয়া আছে। কিন্তু পাইপ ত জলের মধ্যে ভাসিয়া থাকে না,—থাকে একেবারে জলের নীচে, সমুদ্রতলদেশের মাটির উপরে! ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, সামুদ্রিক জীবের অস্তিত্ব শুধু একটা নির্দ্দিষ্ট গভীরতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে; সমুদ্রের সকল স্থানে, এমন কি, গভীর সমুদ্রের নিম্নতম প্রদেশেও প্রাণীদের বাস থাকিতে পারে! এই ঘটনার পর হইতেই কৌতূহলী মানুষ তাহাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিবার জন্য বরুণ দেবের রাজ্য তোলপাড় করিবার আয়োজনে লাগিয়া গেল। সুরু হইল অতলের রহস্য জানিবার অভিযান। বৈজ্ঞানিক, ভৌগোলিক, প্রাণিতত্ত্ববিদ্ এবং চিত্রকর—সব দল বাঁধিয়া নানা রকমের যন্ত্রপাতি লইয়া বিরাটকায় জাহাজে চড়িয়া এক সমুদ্র হইতে অন্য সমুদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাঁহাদের অনুসন্ধানের বিষয় হইল—
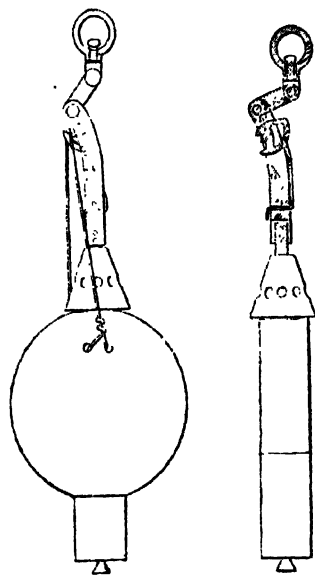
সাউণ্ডিং মেশিন

বাঁদিকের ছবিটিতে লোহার বলের ফুটার মধ্যে চোঙা বসান; ডানদিকের ছবিতে শুধু চোঙাটি দেখান হইয়াছে —পৃঃ ১৯
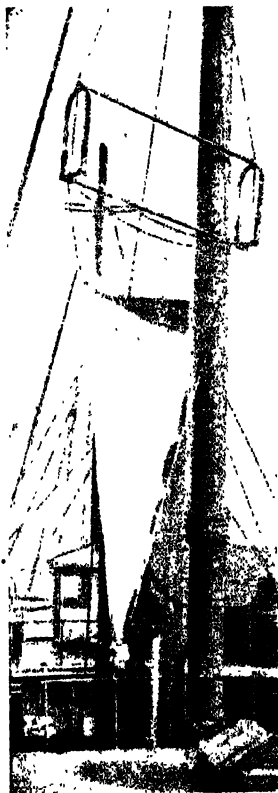
ট্রল-যন্ত্র —পৃঃ ২৫

সমুদ্রের গভীরতা, সাগরজলের তাপ, প্রাণী ও উদ্ভিদাদি।

সমুদ্রের গভীরতা মাপিবার কাজে সাধারণতঃ যে যন্ত্রের ব্যবহার হয়, তাহাকে ইংরেজীতে বলে 'সাউণ্ডিং মেশিন' (sounding machine). যন্ত্রটি অতি সাদাসিধে ধরণের। অতি সূক্ষ্ম ইস্পাতের তারের সহিত লোহার একটি ছোট চোঙা বাঁধিয়া সেটিকে সাবধানে সমুদ্রে নামাইয়া দেওয়া হয়। চোঙাটি জলের নীচের মাটি স্পর্শ করিবা মাত্রই ইস্পাতের তার বহিয়া ক্ষীণ একটি কম্পন উপস্থিত হয় একেবারে জলের উপরিভাগে—যেখানে বসিয়া পরীক্ষা হইতেছে। জলের মধ্যে যতখানি তার ফেলা হয় উহার দৈর্ঘ্য যত, যেখানে পরীক্ষা হয়, সেখানে সমুদ্রের গভীরতাও তত। স্থল-ভাগের উপর দিয়া দূরত্ব প্রকাশ করিবার জন্য আমরা সাধারণতঃ 'ফুট', 'হাত', 'গজ' অথবা 'মাইল' ব্যবহার করি। কিন্তু জলের গভীরতা প্রকাশ করিবার

জন্য ব্যবহার করা হয় 'ফ্যাদম' (fathom ,-
এক ফ্যাদম ছয় ফুট বা চারি হাতের সমান।

চোঙাটি খুব ভারী হইলে চলে না। কারণ, ভারী চোঙাকে গভীর জলের নিম্নভাগ হইতে টানিয়া তুলিবার সময়ে সরু তার ছিঁড়িয়া যায়। অথচ নিতান্ত হাল্‌কা জিনিস হইলে চারি পাঁচ হাজার ফ্যাদম জলের তলে পেঁাছিতে উহার সময় লাগে অনেক। এই জন্য চোঙার সঙ্গে একটি ভারী জিনিস জুড়িয়া দেওয়া হয়। ভারী জিনিসটি কামানের গোলার মত লোহার একটি বল মাত্র। বলটির ভিতর দিয়া ফুটো করিয়া চোঙাটিকে সেই ফুটোর মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। তোমরা হয় ত ব্যস্ত হইয়া ভাব যে,—ভারী বলশুদ্ধ চোঙাটিকে টানিয়া তোলে কি করিয়া ? সরু তার ছিঁড়িয়া যায় না! কিন্তু যন্ত্র যাঁহারা তৈয়ারী করিয়াছেন এ প্রশ্নটা তাঁহাদের মনেও জাগিয়াছিল। তাই তাঁহারা ইহার ব্যবস্থাও করিয়াছেন। বলটিকে এমন কৌশলে

চোঙার সঙ্গে লাগান হয় যে, যন্ত্রটি মাটি ছুঁইতে না ছুঁইতেই সেটি চোঙা হইতে খসিয়া পড়ে। তখন চোঙাটিকে টানিয়া তুলিতে আর কোন অসুবিধাই হয় না।

তোমরা মনে করিতে পার যে, চোঙাটিকে নীচ হইতে না তুলিলেই বা এমন ক্ষতি কি? এতটুকু ত চোঙা, তাহার কতই বা দাম! কিন্তু মূল্যের জন্য নয়—চোঙাটিকে উপরে তুলিবার অন্য কারণ আছে। উহার তলায় এক টুকরা সাবান অথবা মোম বেশ শক্ত করিয়া আঁটিয়া দেওয়া হয়। চোঙা যখন সমুদ্রের তলায় পৌঁছে, তখন সেখানকার কিছু মাটি ঐ সাবান বা মোমে লাগিয়া যায়। চোঙাটিকে উপরে আনিয়া উহার তলা পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারা যায়, ঐ স্থানের মাটির রং কি এবং তাহার উপাদানই বা কি!

যন্ত্রটির আর একটি আশ্চর্য্য গুণ আছে। যখন সেটি নীচের দিকে যায়, তখন চোঙাটির উপরের

মুখ খোলা থাকে ; কিন্তু নীচ হইতে টানিয়া তুলিবার সময় সমুদ্রের নিম্নতম প্রদেশের জল লইয়া খোলা মুখটি বন্ধ হইয়া যায়। ইহা হইতেই আমরা সমুদ্র-তলের জলের বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ এবং অন্যান্য বিশেষত্ব জানিতে পারি। চোঙাটির কাছে তারের সহিত তাপমান যন্ত্র বাঁধা থাকে। ইহাতে সমুদ্রের তলদেশের জলের তাপও ধরা পড়ে। কখনও কখনও তারের খানিকটা দূরে দূরেই একটি করিয়া তাপমান বাঁধিয়া দেওয়া হয়। উহাদের সাহায্যে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে একেবারে তলদেশ পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্থানের তাপ নির্ণয় করা যায়। পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে, বিষুব-রৈখিক অঞ্চলে প্রশান্ত মহাসাগরের জলের উপরিভাগের তাপ-পরিমাণ ৮০ ডিগ্রি ফাঃ, একশত ফ্যাদম নীচে ৬০ ডিগ্রি ফাঃ, চারিশত ফ্যাদম নীচে ৪৫ ডিগ্রি ফাঃ এবং এক হাজার ফ্যাদম নীচে মাত্র ৩৫ ডিগ্রি কি ৩৬ ডিগ্রি ফাঃ।

সমুদ্রজলের তাপ-প্রসঙ্গে তোমরা আর একটি বিষয় জানিয়া রাখ। মেরু-অঞ্চলের ভয়ানক শীতের কথা তোমরা শুনিয়াছ। অত্যধিক শীতের দরুণ সেখানকার সমুদ্রের জল জমিয়া বরফ হইয়া আছে। জলের তাপ ৩২ ডিগ্রির কম হইলে তাহা বরফে পরিণত হয়। সুতরাং মেরুপ্রদেশে সমুদ্রের উপরি-ভাগের জলের তাপ ৩২ ডিগ্রির কম। তাহা হইলে বিষুব-রৈখিক অঞ্চলের সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপের সহিত তার পার্থক্য দাঁড়ায় প্রায ৫০ ডিগ্রি। বরফ জল অপেক্ষা হাল্‌কা বলিয়া, উহা ডুবিয়া যায় না, কঠিন আবরণের মত জলের উপর ভাসিতে থাকে। এই কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া উপরের শীতল বায়ু নীচের জলে লাগিতে পারে না। এইজন্য মেরু-সাগরের সমস্ত জলই বরফ হইয়া যায় না; বরফরাশির নীচের জলে মাছ এবং অন্যান্য জলচর প্রাণী অনায়াসে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। মেরুর নিকটবর্ত্তী সমুদ্রের তলদেশে জলের তাপ ৩০ কি

৩১ ডিগ্রি * আর বিষুব-রেখার নিকটবর্ত্তী সমুদ্রের নিম্নদেশে জলের তাপ ৩৩ হইতে ৩৫ ডিগ্রির মধ্যে। সুতরাং সমুদ্রের নিম্নতম স্থান দিয়া বিভিন্ন স্থানে তাপের পার্থক্য হয়—মাত্র ৩ হইতে ৪ ডিগ্রি!

পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সর্ব্বাপেক্ষা গভীর সমুদ্র হইতেছে প্রশান্ত মহাসাগর। এই মহাসাগরের গভীরতম স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৩৪৮ ফ্যাদম বা ৩২০৭৮ ফুট—অর্থাৎ ৬ মাইলেরও বেশি নীচে। হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউণ্ট এভারেষ্টকে (২৯০০২ ফুট) যদি সে-স্থানে নিয়া দাঁড় করান যায়, তবে তাহাকে সম্পূর্ণ ডুবাইয়াও তাহার উপরে জল হইবে ৩০৭৬ ফিট!

সমুদ্রের তলার জীব ধরিয়া আনিবার জন্য একপ্রকার জাল-যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ইংরেজীতে এই যন্ত্রের কোনটিকে বলে ড্রেজ (dredge),

* বিশুদ্ধ জল বরফ হয় ৩২ ডিগ্রি তাপ হইলে, আর সমুদ্রের লোনা জল বরফ হয়, তাপ ৩০ ডিগ্রির নীচে নামিলে।

জেলিফিস ও তারামাছ—পৃঃ ২৫

সমুদ্রের তলায় মাটি অণুবীক্ষণের সাহায্যে এরূপ দেখায়—পৃঃ ২৭

কোনটিকে বলে ট্রল (trawl). ড্রেজ যন্ত্রটি বেশ ভারী। জলের নীচের মাটির উপর দিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া তারপর যন্ত্রটিকে উপরে উঠান হয় এবং জালে যা কিছু ধরা পড়ে তা পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। উপরের দিকের জলে যে সব প্রাণী বাস করে, তাহাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর অনেককে সমুদ্রের তলায়ও পাওয়া যায়; কিন্তু নীচের দিকে প্রাণীদের সংখ্যা ক্রমশঃই বিরল। সমুদ্রের নিম্নদেশে তারামাছ (star-fish), নানা জাতীয় শামুক, কড়ি, গেঁড়ি ত আছেই, নানা রকমের ছোট-বড় মাছেরও সেখানে অভাব নাই।

সমুদ্রের নীচ হইতে যে সব জীব তোলা হয়, তাহাদের কাহারও কাহারও বেশ সুগঠিত চক্ষু দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইতেই অনুমান করা যায় যে, চার-পাঁচ মাইল গভীর জলের নীচেও কিছু-না-কিছু আলো আছে। আলো না থাকিলে এইসব প্রাণী চোখ দিয়া কি করে? ভগবান্ ত কোনো জিনিসই

অযথা সৃষ্টি করেন না। আলো যে আছে তার প্রমাণ এক রকম পাওয়া গেল ; কিন্তু অত নীচে আলো যায় কোথা হইতে! সূর্য্যরশ্মি সাগরের জল ভেদ করিয়া অনেক দূর নীচে যায় বটে, কিন্তু চারি-পাঁচ মাইল গভীর লোনা জলের ভিতর দিয়া সেই রশ্মি একেবারে তলায় নিশ্চয়ই পৌঁছিতে পারে না। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, যে-ফস্‌ফোরিসিনের সাহায্যে জোনাকী পোকার আলো জ্বলে, সেই রকমের কোনও পদার্থ সাগরজলেও আছে এবং তারই সাহায্যে অতলের চক্ষুষ্মান্ প্রাণীরা পথ দেখিয়া চলে।

ভূপৃষ্ঠ যেমন উঁচু-নীচু, সাগরের তলদেশও তেমনি উঁচু-নীচু। কিন্তু অগভীর ও অপরিসর খাত সমুদ্রতলায় থাকিতে পারে না। মৃত সামুদ্রিক জীবের কঙ্কাল আর খোলসের অতি সূক্ষ্ম কণায় সেগুলি ভরিয়া যায়। খোলস ও অস্থিগুলি জলের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে অণুপরমাণুতে পরিণত হইয়া

তলায় গিয়া জমা হয়। সেই জন্যই সমুদ্রের নীচে শক্ত মাটি কিংবা কাঁকর পাওয়া যায় না। সামুদ্রিক জীবের কঙ্কালাদি ছাড়া জলের নীচের আগ্নেয়গিরি হইতে উত্থিত ভস্ম ও গলিত পদার্থগুলিও কালক্রমে চূর্ণ হইয়া সমুদ্রতলা-গঠনে সাহায্য করে। সমুদ্রের তলদেশের মাটির রং সাধারণতঃ নীলাভ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত গভীর স্থানগুলির উপরে লাল কাদার একটি স্তর আছে।

সাগরে অতিক্ষুদ্র প্রাণী আছে—যা অণুবীক্ষণের সাহায্যেও ভাল করিয়া দেখা যায় না, এবং অতিকায় তিমি আছে—যাহার মত প্রকাণ্ড জীব আর পৃথিবীতেই নাই। আরো নানা আকারের, অদ্ভুত গড়নের, বিচিত্র বর্ণের—নিরীহ, হিংস্র, ভয়াবহ কত প্রাণী যে সমুদ্রে আছে, তাহার সংখ্যাও ঠিক করা যায় না। সাগরের বুকে মহামূল্য মণিমুক্তা আছে, তাই উহার এক নাম রত্নাকর। অগভীর সমুদ্রের তলায় আশ্চর্য্য রকমের উদ্ভিদ্‌ও আছে বিস্তর।

জলের নীচে পাহাড় আছে, আগ্নেয়গিরি আছে, উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, প্রবাল-রচিত দ্বীপ আছে। সমুদ্রে স্রোত বহে, ঢেউ ওঠে, জোয়ার ভাটা হয়। আরও বড় হইলে সে সব সম্বন্ধে বহু আশ্চর্য্য কাহিনী তোমরা জানিতে পারিবে।

যে বিশাল জলভাগ সারা পৃথিবীর চারিভাগের প্রায় তিন ভাগই দখল করিয়া আছে, তাহার অনন্ত রহস্যের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই প্রবন্ধে গভীর সমুদ্রের তলদেশ সম্বন্ধে তোমাদিগকে সামান্য একটু আভাস দিলাম মাত্র।

সমুদ্র-শাসন

অনেকদিন আগে ইংলণ্ডে ক্যানিউট নামে একজন রাজা ছিলেন। সভাসদ্‌গণ তাঁহার পরাক্রমের অত্যধিক প্রশংসা করিয়া প্রায়ই বলিতেন, "মহারাজ, বিক্রমে পৃথিবীতে আপনি অদ্বিতীয় ; অসীম অশান্ত সমুদ্র পর্য্যন্ত আপনার আদেশ মানিয়া চলে।"

একদিন রাজা সভাসদ্‌গণসহ সমুদ্রের তীরে উপস্থিত। তাঁহার মনোরঞ্জনের জন্য সভাসদেরা অভ্যাসমত বলিতে লাগিল, "মহারাজ, বিশাল সমুদ্রেও আপনার আদেশ মানিয়া চলে।"

রাজা দেখিলেন, চাটুকারদের অযথা স্তোক-বাক্যের অসারতা প্রমাণ করিবার এই-ই সুযোগ।

তিনি অনুচরদিগকে আদেশ দিলেন, "আমার সিংহাসন সমুদ্র-সৈকতে জলের কিনারায় স্থাপন কর।"

ভৃত্যেরা আদেশ পালন করিল।

ক্যানিউট সিংহাসনে বসিয়া গুরু-গম্ভীরস্বরে সমুদ্রকে আদেশ দিলেন, "আমার সিংহাসন পর্য্যন্তই তোমার সীমা। খবরদার, এই সীমা অতিক্রম করিও না।"

অল্পক্ষণ পরেই সমুদ্রে জোয়ার হইল এবং দেখিতে দেখিতে ঢেউএর পর ঢেউ আসিয়া রাজার বহুমূল্য পরিচ্ছদ ভিজাইয়া দিতে লাগিল। তিনি তখন অপ্রস্তুত সহচরদিগকে কহিলেন, "দেখিলে ত! মহাসমুদ্র মানুষের শাসন মানে না; প্রকৃতির অসীম শক্তির নিকট মানুষের ক্ষুদ্র শক্তি অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য।"

ক্যানিউট যেদিন একথা বলিয়াছিলেন, সেদিন মানুষের শক্তি প্রকৃতির শক্তির তুলনায় হয় ত অতি

তুচ্ছই ছিল। কিন্তু নয়শত বৎসর পরে আজ সেই দুর্দ্দান্ত সমুদ্র মানুষের কাছে পরাজয় মানিয়াছে। কেমন করিয়া—বলিতেছি।

ইউরোপ মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ক্ষুদ্র হল্যাণ্ড দেশ। হল্যাণ্ড বা Hollowland-এর অন্য নাম Netherlands. উভয় শব্দের অর্থই নিম্নভূমি। আয়তনে হল্যাণ্ডদেশ আমাদের বর্দ্ধমান বিভাগের প্রায় সমান। এই দেশের অধিবাসীরা ওলন্দাজ বা ডাচ্ নামে পরিচিত। ওলন্দাজদের জন্মভূমির পরিসর অতি সামান্য হইলেও সাহস ও অধ্যবসায়ে কিন্তু তাহারা অসামান্য। দিনের পর দিন ক্ষুধিত ও খেয়ালী সমুদ্রের সহিত যুঝিয়া তাহারা বাঁচিয়া আছে; এবং শুধু তাই নয়, নির্ম্মম সমুদ্রের গ্রাস হইতে মাতৃভূমির অংশ-বিশেষকে মুক্ত করিয়া নিজেদের বুদ্ধি, বীরত্ব ও কৌশলের পরিচয় দিতেছে।

রাইন, শেল্ড ও মায়াজ—ইউরোপের এই তিনটি নদী হল্যাণ্ডের ভিতর দিয়া উত্তর সাগরে

পড়িয়াছে। হল্যাণ্ডের উপকূল-অঞ্চল এই তিন নদীর ব-দ্বীপ দ্বারা রচিত। সুতরাং দেশটির অনেক অংশ বিশেষ করিয়া উপকূলভাগ, সমুদ্রে-সমতলের নিম্নে অবস্থিত। তোমাদের মনে হইতে পারে, সমুদ্র-সমতলের নীচে আবার স্থল থাকে কেমন করিয়া! কথাটা বুঝাইয়া বলিতেছি। মনে কর, তটভূমি ক্রমশঃ অতি সামান্য ঢালু হইয়া সমুদ্রের দিকে গিয়াছে—অর্থাৎ কূল হইতে আধ-মাইল হাঁটিয়া গেলেও হয় ত কোমরজলের বেশি হয় না। এখন সমুদ্রের এই অগভীর অংশের কতকটা স্থান পাথরের শক্ত প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া ভিতর হইতে যদি সবটা জল সেচিয়া ফেলা যায় এবং বাহির হইতে সমুদ্রের জল যাহাতে ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে তাহারও উপযুক্ত ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলেই ত প্রাচীরের বাহিরের জল অপেক্ষা প্রাচীর-বেষ্টিত স্থলভাগ রহিল নীচে। ওলন্দাজেরা করিতেছেও বাস্তবিক তাহাই। সমুদ্রের কূলে কূলে

বহুদূর বিস্তৃত বাঁধ (dyke) প্রস্তুত করিয়া অশান্ত সমুদ্রের অক্লান্ত আক্রমণকে তাহারা রোধ করিয়া রাখিতেছে।

সমুদ্রের সহিত ওলন্দাজদের এই অবিরাম যুদ্ধে তাহাদের ধন ও জন ক্ষয় হইয়াছে অনেক। ১২৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সমুদ্র হইতে প্রবল এক বন্যা আসিয়া ত্রিশখানি গ্রাম নষ্ট করিয়া ফেলে। তাহার পর ১৪২১ খ্রীষ্টাব্দে আসিল আর এক সর্ব্বগ্রাসী প্লাবন ; এবং সে ধ্বংস করিয়া গেল বায়াত্তরখানি গ্রাম ও লক্ষাধিক প্রাণী! পূর্ব্বে যেখানে ছিল শস্যশ্যামল মাঠ ও আনন্দমুখরিত জনপদ, সেখানে সৃষ্ট হইল ঘাসে-ছাওয়া নির্জ্জন জলাভূমি। ইহাতেও সমুদ্রের ক্ষুধা মিটিল না। উপকূল হইতে কিছু দূরে, শ্যামলিমার মাঝখানে ছিল ছোট একটি হ্রদ। স্থলভাগ ধ্বসিয়া যাওয়ায় লোলুপ সমুদ্র ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া ঐ হ্রদের সহিত যোগস্থাপন করিয়া বসিল। ফলে, যেস্থানে ছিল তাজা সবুজ শস্যের

ক্ষেত—সেস্থানে উৎপন্ন হইল আশী মাইল দীর্ঘ আর চল্লিশ মাইল প্রস্থ এক অগভীর উপসাগর। ইহাই অধুনা বিখ্যাত জুইডার জী (Zuyder Zee).

. ওলন্দাজেরা দেখিল, এইভাবে সমুদ্র যদি অগ্রসর হইতে থাকে, তবে একদিন পৃথিবীর মানচিত্র হইতে তাহাদের ক্ষুদ্র দেশটি নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। সুতরাং তাহারা দৃঢ় পণ করিল, সমুদ্রের এই চৌর্য্য-বৃত্তির প্রশ্রয় তাহারা কিছুতেই দিবে না। তাহারা সমুদ্রের উপকূলে, নদীর তীরে তীরে দৃঢ়, উচ্চ ও অপ্রবেশ্য প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া নিম্ন জলাভূমি হইতে হাওয়া-চালিত (wind-mill) দমকলের সাহায্যে জল সেচিয়া ফেলিতে লাগিল এবং অসংখ্য সুদীর্ঘ খালের ভিতর দিয়া সমুদ্রের জল সমুদ্রে পাঠাইয়া দিল। একবার ভাবিয়া দেখ, চিরশত্রু সমুদ্রের আক্রমণ হইতে জন্মভূমিকে রক্ষা করিতে গিয়া ওলন্দাজেরা কত শক্তি, কত পরিশ্রম ও কত অর্থ ব্যয় করিয়াছে !

কিন্তু আত্মরক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াই ক্ষান্ত থাকিবার পাত্র হল্যাণ্ডবাসিগণ নয়। শত শত বৎসর পূর্ব্বে দেশের যে সকল অংশ সমুদ্রে অপহরণ করিয়া নিয়াছিল, তাহার কবল হইতে সে-সব উদ্ধার করিয়া আনিবার জন্য তাহারা অক্লান্ত-কর্ম্মী হইয়া লাগিয়াছে। তাহাদের এই অসাধ্য-সাধনের সহায় হইয়াছে আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি।

প্রথমে তাহারা স্থির করিল, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হ্রদ হারলেমকে জলশূন্য করিয়া নিজেদের শক্তির পরীক্ষা করিবে। তিনটি প্রকাণ্ড বাষ্প-চালিত দমকল অহর্নিশ খাটাইয়া দীর্ঘ চারি বৎসরে হারলেম হ্রদের সমস্ত জল তুলিয়া ফেলা হইল এবং কিছুদিনের মধ্যেই শুষ্ক হ্রদের বুকে তাজা শাকসব্জী ও ফুলের বাগান শোভা পাইতে লাগিল! ওলন্দাজগণের মুখে তখন সাফল্যের আনন্দ আর ধরে না।

হারলেম-বিজয়ে উৎফুল্ল হইয়া ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা জুইডার জী আক্রমণে মনোযোগ দিল।

জুইডার জী আয়তনে হারলেম অপেক্ষা প্রায় বিশগুণ বড়। সম্পূর্ণ উপসাগরটাকে একসঙ্গে জলশূন্য করিবার প্রচেষ্টা যথেষ্ট সময়-সাপেক্ষ, এবং তাহাতে অসুবিধাও অনেক। কাজেই উহার এক এক অংশকে এক এক বারে জলশূন্য করিবার ব্যবস্থাই সমীচীন বোধ হইল। যথোপযুক্ত আয়োজন ও উপকরণ সংগ্রহ করিতে কয়েক বৎসর কাটাইয়া বিগত ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা জুইডার জীর উদ্ধারকার্য্যে লিপ্ত হইয়াছে। প্রথমে তাহারা ঊনিশ মাইল দীর্ঘ একটি বাঁধ দ্বারা উপসাগরের এক অংশ ঘিরিয়া ফেলে। তারপর সেই অংশটিকে চারিভাগে ভাগ করিয়া ক্রমান্বয়ে এক এক ভাগ হইতে জল সেচিবার বন্দোবস্ত করা হয়।

ওলন্দাজগণের বাঁধ-প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ :— প্রথমে শক্ত ব্রাশ-উডের (brush wood) আঁটি জলের মধ্যে ফেলিয়া উহার উপর বালু, কাঁকর ও মাটি ঢালিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে

বাঁধ প্রস্তুত প্রণালী—শক্ত ব্রাশ উডের আঁটি জলের মধ্যে ফেলিয়া উহার উপর বালু, কাঁকর ও মাটি ঢালিয়া দেওয়া হইতেছে—পৃঃ ৩৬
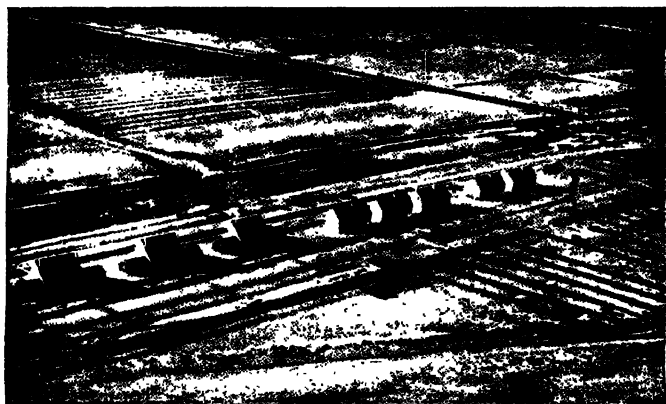
সাগর-জল হইতে উদ্ধার-করা ভূমি—পোল্ডার—পৃঃ ৩৭

ভিত্ তৈয়ার করিয়া উহার উপর কন্‌ক্রীট, অথবা ইট-পাথরের দেওয়াল গাঁথিয়া দেওয়া হয়। ডাচ্‌গণ হিসাব করিয়া দেখিয়াছিল, এইভাবে কাজ করিয়া গেলে পনের বৎসরের মধ্যে জুইডার জীর এই অংশের জল সেচিয়া ৮২০ বর্গমাইল পরিমিত জমি উদ্ধার করা যাইবে। তাহা হইলে বুঝা যায়, আর দুই-এক বৎসরের মধ্যেই তাহাদের আরব্ধ কার্য্য শেষ হইবে এবং ইহার পরে তাহারা অন্য এক অংশে হাত দিবে।

এই উপায়ে জল হইতে যে ভূমি উদ্ধার করা হয়, তাহাকে পোল্‌ডার (polder) বলে। পোল্‌ডার-গুলি প্রথমেই আর উর্ব্বর থাকে না। উহাদের উপর কিছুদিন ধরিয়া রাস্তা ঝাট দেওয়া ধূলা-ময়লা, গাছের পাতা ও কচি ডালপালা এবং সামান্য পরিমাণে মাটি ফেলিয়া দেওয়া হয়। এইগুলি পচিয়া ও মিলিয়া মিশিয়া মাটিকে উর্ব্বর ও সরস করিয়া তুলিলে উহাতে নানাপ্রকার তরি-তরকারী ও

শাকসব্জীর চাষ করা হয়। উহাতে গোলাপ ফুলও বেশ্ জন্মিয়া থাকে। চাষের কাজে যাহারা ব্যাপৃত থাকে, তাহাদের থাকিবার ব্যবস্থাও সেইখানেই করিতে হয়। ফলে, তথায় গড়িয়া উঠে ফেনিল ঢেউয়ের পরিবর্ত্তে, পরিপাটী ক্ষুদ্র কুটীরে পূর্ণ সুন্দর লোকালয় ; আর সমুদ্রের গর্জ্জনের পরিবর্ত্তে সেখানে শুনিতে পাওয়া যায় কৃষাণ-কৃষাণীদের মধুর কণ্ঠের মিষ্টি গান।

দেখিতে পাইলে, রুদ্র-মূর্ত্তি মহাসিন্ধুও মানুষের শক্তির কাছে পরাভব মানিয়া কেমন দূরে সরিয়া যাইতেছে!

পানামা খাল

যোজক কাটিয়া খাল খনন করিলে গমনাগমনের সময়-সংক্ষেপ ও ব্যয়-সংক্ষেপ হইতে পারে,—অতি প্রাচীনকালেও এই কথা মানুষের মনে জাগিয়াছিল। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সুয়েজ খালের পথে গমনাগমনের ব্যবস্থা করিয়া ফার্ডিন্যাণ্ড-ডি-লিসেপ্‌স্‌ মানুষের বহুদিনের চেষ্টা কার্য্যে পরিণত করিলেন। ইহার পরেই সমগ্র জগতের দৃষ্টি পড়িল পানামা যোজকের প্রতি। সুয়েজ খালের পথে দূরত্ব কমিল ৩০০০ মাইল, আর পানামা যোজক কাটিয়া দিলে দূরত্ব কমে প্রায় ৯০০০ মাইল! সুয়েজের দৈর্ঘ্য প্রায় ১০০ মাইল, আর পানামার দৈর্ঘ্য মাত্র ৫০ মাইল।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী সংকীর্ণতম স্থলভাগটি কাটিয়া আট্ল্যাণ্টিক্ ও প্রশান্ত মহাসাগর দুইটিকে যুক্ত করিয়া দিবার প্রস্তাব সুয়েজ খাল খুলিবার পূর্ব্বেও হইয়াছিল। তখন স্থির হইয়াছিল, মধ্য-আমেরিকার নিকারাগুয়া প্রদেশের মধ্যে যে সকল হ্রদ আছে, সেগুলিকে যুক্ত করিয়া খাল কাটা-ই সঙ্গত; কেন না পানামা যোজক অপেক্ষা এস্থানের পরিসর অধিক হইলেও পথে হ্রদগুলি থাকায় খনন-কার্য্যের ব্যয় অনেকটা বাঁচিয়া যাইবে। কিন্তু আশঙ্কাও হইল, নিকারাগুয়া প্রদেশের সজীব আগ্নেয়গিরিগুলির উৎপাতে এবং ঘন ঘন ভূমিকম্পের ফলে খালটি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং ইন্‌জিনিয়ারগণ খালের জন্য দুর্গম, কিন্তু নিরাপদ পানামা যোজকই বাছিয়া লইলেন।

সুয়েজ খাল খুলিবার পর পানামা যোজক কাটিবার আগ্রহ লোকের বাড়িয়া গেল। খাল খননের জন্য একটি কোম্পানি গঠিত হইল এবং

সুয়েজ খালের প্রতিষ্ঠাতা যশস্বী কর্ম্মবীর ফার্ডিন্যাণ্ড-ডি-লিসেপ্‌স্‌এর উপর এই খাল খননের ভার অর্পিত হইল। এই সময় লিসেপ্‌স্‌-এর বয়স ৭০ বৎসরেরও অধিক। কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়, জগতে কর্ম্মের প্রেরণা লইয়া যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, বয়স বাড়িয়া গেলেও কর্ম্মে তাঁহাদের উৎসাহ কমে না। বৃদ্ধ লিসেপ্‌স্‌ পানামায় গেলেন এবং স্থানটি পরিদর্শন করিয়া খাল খননের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়। অভিজ্ঞ ইন্‌জিনিয়ার স্থান নির্ব্বাচনে ভুল করিয়া বসিলেন এবং আরও একটি ভ্রম করিলেন এই স্থির করিয়া যে, খালের জল ও সমুদ্রের জল একই সমতলে থাকিবে। খালকাটা সুরু হইলে দেখা গেল, স্থানটি ভয়ানক উচু-নীচু এবং মাঝে মাঝে কঠিন পাহাড়-পর্ব্বত ও জলাভূমি অবস্থিত। ইহার উপর আর এক উপদ্রব,—খননের পথে চ্যাগ্রেস্ (Chagres) নামক পার্ব্বত্য নদীর প্রবল স্রোত

আসিয়া ভয়ানক উৎপাত ঘটায়। এই সকল প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুঝিয়া কোম্পানি দেউলিয়া হইয়া যাওয়াতে খাল খনন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল এবং অকৃতকার্য্যতার কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করা হইল। কমিটির তদন্তের ফলে বেচারা লিসেপ্‌স্‌ অবহেলা ও অসাবধানতার দোষে অভিযুক্ত হইলেন। লিসেপ্‌স্‌-এর পুত্র পিতার সহকারীরূপে তাঁহার কাজ করিতেছিলেন। পিতৃভক্ত পুত্র পিতার সমস্ত ত্রুটি নিজের স্কন্ধে লইয়া তাঁহাকে অভিযোগ হইতে মুক্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন। ইহাব অল্পকাল পরেই ভুবনবিখ্যাত প্রবীন ইন্‌জিনিয়ার ভগ্ন-হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন। কিন্তু সুয়েজ খাল খনন করিয়া তিনি যে অমর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, পানামা খননে অকৃতকার্য্য হইলেও সেই কীর্ত্তি কিছুমাত্র ম্লান হইয়া যায় নাই।

এই সকল দুর্ঘটনার বহুদিন পরে আমেরিকার যুক্ত-রাজ্য পানামা সরকারের নিকট হইতে ৫০

মাইল দীর্ঘ ও ১০ মাইল প্রস্থ ভূমির চিরস্থায়ী ইজারা লইয়া ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে খনন-কার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু আরম্ভ করিলে কি হইবে, পূর্ব্বের প্রতিকূল অবস্থার একটিও বিদূরীত হয় নাই। সেই কঠিন পার্ব্বত্য স্থান, সেই জলাভূমি, সেই চ্যাগ্রেস্ নদীর ভীষণ স্রোত! ইহার উপর আবার এক নূতন উৎপাত। জলাভূমিতে অসংখ্য মশকের বাস। মশকের কামড়ে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হইয়া শ্রমিকেরা দলে দলে পঙ্গপালের মত মরিতে লাগিল। সুয়েজ খাল খননের সময়ও জলের অভাবে এমনি দলে দলে কুলিমজুর মরিয়াছিল। মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য প্রকৃতিকে বশে আনিবার যে-সকল প্রচেষ্টা করা হয়, কত মানুষেরই প্রাণের বিনিময়ে তাহা সফল হইয়া উঠে, একথা আমরা কয়জনে ভাবিয়া দেখি!

প্রাকৃতিক বাধা-বিঘ্নের সহিত চৌদ্দ বৎসরকাল সংগ্রাম করিয়া মানুষের বুদ্ধি, উৎসাহ ও অধ্যবসায়ই অবশেষে জয় লাভ করিল—অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে

আট্‌ল্যাণ্টিক মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর যুক্ত হইল।

পানামা খালের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০ মাইল। আট্‌ল্যাণ্টিক মহাসাগর হইতে প্রবেশের পথে কোলন বন্দর। এখান হইতে ১০ মাইল দীর্ঘ ও প্রায় ৫০০ ফুট প্রশস্ত খালদ্বারা গাতুন (Catun) হ্রদে পৌঁছিতে হয়। চ্যাগ্রেস্ নদীর উপত্যকায় একটি বাঁধ প্রস্তুত করিয়া নদীর জলধারা আট্‌কাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহাই গাতুন হ্রদ। ইহা সমুদ্র-সমতল হইতে প্রায় ৮৫ ফুট উচ্চে। আটল্যাণ্টিক মহাসাগরের দিকে খালের জল আর সমুদ্রের জল এক সমতলে, কিন্তু ৭ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া গাতুনের নিকটবর্ত্তী হইলে খালের জল অপেক্ষা গাতুনের জল দেখা যায় অনেক উচ্চে। কিন্তু এত উচ্চ স্থানে জাহাজ উঠিবে কিরূপে? সুদক্ষ ইন্‌জিনিয়ারগণ তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। খালের যে যে স্থানে জলের উপরিভাগের উচ্চতা অসমান,
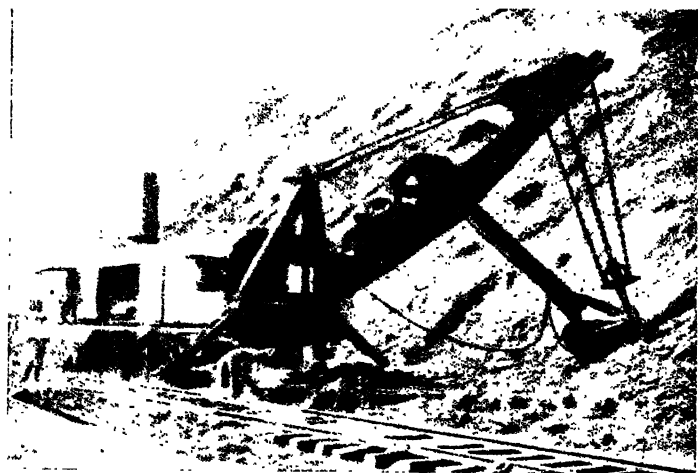
খাল খননের জন্য মাটি ও পাথর কাটা হইতেছে—পৃঃ ৪৩
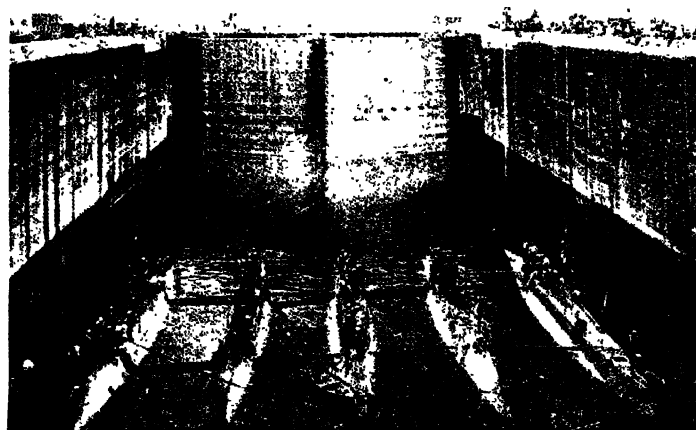
পানামা খালে কলের দরজা বা 'লকগেটের' দৃশ্য—পৃঃ ৪৫

সেই সকল স্থানে কলের দরজা (lock gates) আছে। জাহাজ গাতুনের নিকট আসিলে কলের সাহায্যে খালের জলের উচ্চতা বৃদ্ধি করিয়া গাতুনের সমতল করা হয়; তখন জাহাজ অনায়াসেই গাতুনে প্রবেশ করিতে পারে। গাতুন হ্রদ দিয়া জাহাজ ২৪ মাইল পথ যায়। ইহার পর পর্ব্বতের ভিতর দিয়া ৯ মাইল খাল খনন করা হইয়াছে। এই পথ অতিক্রম করিলে জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে পেড্রো-মিগুয়েল (Pedro Miguel) নামক স্থানে আসে। সেখানে কলের দরজা বন্ধ করিলে জল ৩০ ফুট নামিয়া পরবর্ত্তী খালের সমতল হয়। সেই খালদ্বারা মিরাফ্লোরিসে (Miraflores) পৌঁছিলে সেখানকার কলের দরজার সাহায্যে জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরের সমতলে নামিয়া আসে। পরে খালপথেই আরও ৪ মাইল চলিয়া জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরে উপস্থিত হয়। খালের এই দিকেই পানামা বন্দর অবস্থিত।

খালের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০ মাইল এবং গভীরতা প্রায় ৪৫ ফুট। খালের কিনারা দিয়া রেলপথ বসান। এই রেলপথে তড়িৎ-চালিত ইনজিনের সাহায্যে জাহাজগুলিকে টানিয়া লওয়া হয়। সম্পূর্ণ খাল অতিক্রম করিতে প্রায় ১০।১২ ঘণ্টা সময় লাগে। যুক্ত-রাজ্যের জাহাজ ব্যতীত কর দিয়া অন্যান্য রাজ্যের জাহাজও এই খাল দিয়া যাতায়াত করিতে পারে।

পানামা খাল খনন-কার্য্যে ব্যয় হইয়াছিল প্রায় দেড়শত কোটি টাকা এবং সময় লাগিয়াছিল ১৪ বৎসর। ১৯১৪ সনের আগষ্ট মাস হইতে পানামা খাল দিয়া জাহাজ চলাচল আরম্ভ হয়। পানামা খাল উদ্‌ঘাটন উপলক্ষে পানামায় এক বিরাট আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল এবং আমাদের ভারতবর্ষ হইতেও চারুশিল্পের নিদর্শন-স্বরূপ বিবিধ দ্রব্য তথায় প্রেরিত হইয়াছিল।

লণ্ডনের পাতাল-যান

লণ্ডনের পাতাল-যান বর্ত্তমান যুগের সপ্তাশ্চর্য্যের একটি।

কলের জাহাজ, রেলগাড়ী, এরোপ্লেন, বেলুন ইত্যাদি আজকালকার ছেলেমেয়েদের কাছে মোটেই নূতন কিছু নয়। সমুদ্রের অথই জলের নীচ দিয়া 'সাব্‌মেরিন' নামক জলযান অবলীলাক্রমে যাতায়াত করিয়া থাকে, একথাও অনেকে শুনিয়াছ বা পড়িয়াছ। কিন্তু আশী-নব্বই ফুট মাটির নীচ দিয়া সুড়ঙ্গ-পথে রেলগাড়ীতে করিয়া মানুষ কি ভাবে যাতায়াত করে, তাহা চিন্তা করা একটু মুস্কিল নয় কি?

প্রথমেই হয় ত তোমাদের মনে হইবে, ‘অত নীচে রেল বসান হইয়াছে কেমন করিয়া! যে সকল লোক পাতাল-পথে চলাচল করে, আলো ও বাতাসের অভাবে তাহাদের কি দম আট্‌কাইয়া যায় না! আর যদি ভূমিকম্পের ফলে উপরের মাটি ধ্বসিয়া যায়, তবে নীচেকার লোকদের জীবন্ত সমাধি ত অনিবার্য্য!’ কিন্তু আমি তোমাদিগকে খুব দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, যদি তোমাদের কাহারও লণ্ডন যাইবার সুযোগ হয়, আমার বিশ্বাস অনেকের হইবেও, তবে উপরের ট্রাম বা বাসে বেড়ান অপেক্ষা পাতালের রেলপথে বেড়ানই তাহার পক্ষে অধিক লোভনীয় এবং আরামপ্রদ বোধ হইবে।

লণ্ডন পৃথিবীর বৃহত্তম শহর। ইহার লোক-সংখ্যা প্রায় আশী লক্ষ এবং আয়তন ৬৯৯ বর্গমাইল। ট্রামগাড়ী, মোটর-বাস, ট্যাক্সি, বাইসাইকেল ছাড়া মালপত্র বহনের জন্য অসংখ্য ঘোড়ার গাড়ী, লরী ও মোটর ট্রাক্‌ প্রভৃতিও শহরের রাস্তা দিয়া যাতায়াত

করিয়া থাকে। যানবাহন ব্যতীত ফুট্‌পাতে পায়ে হাঁটিয়া প্রত্যহ যত লোক চলাচল করে, তাহাদের সংখ্যাও ভারতের যে-কোন বড় শহরের লোক-সংখ্যার সমান হইবে। এত লোক, এত যানবাহন. যদি রাস্তার উপর দিয়া যাতায়াত করে, তবে রাস্তায় অসম্ভব রকম ভিড় হইয়া যায় এবং তাহাতে দুর্ঘটনারও আশঙ্কা থাকে প্রতি মুহূর্ত্তে। এই সকল অসুবিধার কথা ভাবিয়াই শহরের মাটির নীচ দিয়া রেলপথ বসাইবার সংকল্প লণ্ডনবাসীদের মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল।

প্রথমে মাটির অল্প নীচ দিয়া রেল বসান হইয়াছিল। সেই রেলের উপর দিয়া বাষ্পচালিত ইন্‌জিন ছোট ছোট যাত্রী-গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইত। যাত্রীরা উপরের ভিড় এড়াইবার জন্য সুড়ঙ্গ-পথে চলিত বটে, কিন্তু তাহাতে অসুবিধার অন্ত ছিল না। ইন্‌জিনের কয়লার ধূঁয়ায় আর বাষ্পে সারাপথ সর্ব্বদা মেঘাচ্ছন্ন করিয়া রাখিত।

নীচের প্ল্যাট্‌ফরমগুলিতেও না ছিল বিদ্যুতের আলো, না ছিল তাজা হাওয়া চালাইবার কোন বিশেষ বন্দোবস্ত।

পূর্ব্বে ব্যবস্থা ছিল এই যে, নির্দ্দিষ্ট পথে খাত খনন করিয়া, তলায় রেল বসান হইত এবং গাড়ী চলিবার মত ফাঁক রাখিয়া উপরে খিলান প্রস্তুত করিয়া তাহা মাটি দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু লণ্ডনের বর্ত্তমান পাতাল-পথ অন্য প্রণালীতে প্রস্তুত। মাটির উপর হইতে প্রায় ৯০ ফুট নীচ পর্য্যন্ত এক একটি গর্ত্ত খনন করিয়া উহাদের তলা হইতে সম্মুখের দিকে মাটি ফুঁড়িয়া ধাতুনির্ম্মিত নল (tube) কলের সাহায্যে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। টিউব-ওয়েল বসাইবার কৌশলের সহিত ইহার পার্থক্য শুধু এইখানে যে, টিউব-ওয়েলের নলটি এত মোটা নয় আর ইহা বসান হয় উপর হইতে নীচের দিকে, কিন্তু পাতাল-পথের টিউবটি খুব মোটা অর্থাৎ উহার ব্যাস হইবে প্রায় আট ফুট

এবং ইহা বসান হয় শোয়ানভাবে, সম্মুখের দিকে। অবশ্য এই কাজের জন্য শক্তিশালী যন্ত্রের আবশ্যক হয়—সে-কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন। এই অন্তর্ভৌম চুঙ্গী বা টিউবের ভিতর দিয়া রেল বসান হয়; আর তাহারই উপর দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরামদায়ক, সুদৃশ্য গাড়ীগুলি বিদ্যুতের সাহায্যে চলাচল করিয়া থাকে। টিউবের ভিতর দিয়া বসান বলিয়া লোকে উহার নাম দিয়াছে "টিউব্-রেলওয়ে"।

সুড়ঙ্গ-পথের নলের ব্যাস ৮।৯ ফুটের অধিক হইবে না; কিন্তু প্ল্যাট্ফরমগুলির পরিসর অনেক বেশি। নানা আকারের বৈদ্যুতিক আলো দ্বারা প্ল্যাট্ফরমের সকল স্থান এমনভাবে আলোকিত যে, শীতের দেশের আবছা সূর্য্যালোকের চাইতে সে আলো অনেকগুণ স্পষ্টতর এবং স্পৃহণীয়। উপর হইতে যন্ত্রযোগে অনবরত বিশুদ্ধ বায়ু নিম্নে চালনা করা হয়। সে বায়ুতে শীতের তীব্রতা থাকে না, উহার তাপেরও তারতম্য হইতে দেওয়া হয় না।

কাজেই শীতকালের ঝড়-বাদল বা কুয়াসার দিনে উপরের রাস্তা অপেক্ষা পাতাল-পথে ভ্রমণ করা অধিক আরামদায়ক, সুতরাং লোভনীয়।

এক-একটি টিউব্-ষ্টেশনের দুইটি অংশ—উপরে ষ্টেশন, নীচে প্ল্যাট্‌ফরম। ষ্টেশনের দুই পাশেই হয়ত নানা শ্রেণীর দোকান রহিয়াছে; দোকান-গুলি হইতে ষ্টেশনটি মোটেই পৃথক্ বা বিচ্ছিন্ন নহে। কিন্তু ষ্টেশন চিনিবার সাঙ্কেতিক চিহ্ন ও বিশিষ্ট ধরণের লেখা নিকটে গেলেই লোকের চোখে পড়ে। রাত্রিকালে ষ্টেশনের ছাদে থাকে একটি সন্ধানী আলো। সুতরাং যাত্রীদের ভ্রমে পড়িবার আশঙ্কা মোটেই নাই। ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে যাত্রীরা নানাপ্রকার বিজ্ঞাপন ও সাঙ্কেতিক আলোর সাহায্যে টিকেট কিনিবার স্থান, প্ল্যাট্‌ফরমে যাইবার রাস্তা ইত্যাদি অনায়াসেই চিনিয়া লইতে পারে; কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হয় না। এমন কি, বাক্য ব্যয় না করিয়া গন্তব্য স্থানের

প্ল্যাটফরম -পৃঃ ৫২

প্ল্যাটফরমে নামিবার চলন্ত সিঁড়ি —পৃঃ ৫৪

টিকেটও ক্রয় করা যায়। আমাদের দেশের বড় বড় রেল-ষ্টেশনে স্বয়ংক্রিয় ওজন-যন্ত্র তোমরা দেখিয়া থাকিবে। নির্দ্দিষ্ট ছিদ্রের (slot) মধ্যে একটি আনি প্রবেশ করাইয়া দিয়া যন্ত্রের যথাস্থানে দাঁড়াইলেই ক্ষণেকের মধ্যে তোমার ওজন লেখাসহ একখানি টিকেট অন্য একটি ছিদ্রপথে বাহির হইয়া আসে। লণ্ডনের প্রত্যেক টিউব্-ষ্টেশনেই এইরূপ একাধিক টিকেট-যন্ত্র রহিয়াছে। কোন্ ষ্টেশন পর্য্যন্ত কত ভাড়া, কোন্ স্থানে পয়সা ফেলিতে হয়, তাহা যন্ত্রের গায়েই লেখা আছে। ঠিক মূল্যের মুদ্রা ফেলিয়া দিলেই ঈপ্সিত স্থানের টিকেট বাহির হইয়া আসে। টিকেট ক্রয় করিবার পূর্ব্বে যদি টাকা ভাঙান আবশ্যক হয়, তবে তাহারও বেশ সহজ ব্যবস্থা রহিয়াছে। টিকেট-যন্ত্রের নিকটেই আর একটি যন্ত্র থাকে, তাহাতে টাকা ফেলিয়া দিলেই ভাঙান বাহির হইয়া আসে।

ষ্টেশন হইতে প্ল্যাট্‌ফরমে নামিবার জন্য ইলেক্‌ট্রিক্ লিফ্‌ট বা চলন্ত সিঁড়ি (escalator) ব্যবহার করিতে হয়। পায়ে হাঁটিয়া নামা-উঠা করিবার সিঁড়িও রহিয়াছে, কিন্তু লোকে তাহা বেশি পছন্দ করে না। তোমাদের মধ্যে যাহারা কলিকাতায় বাস কর, লিফ্‌টের সহিত তাহাদের পরিচয় থাকিবার সম্ভাবনা। কিন্তু চলন্ত সিঁড়ি এক অদ্ভুত ধরণের জিনিস। পাশাপাশি দুইটি সিঁড়ি, একটির ধাপগুলি ক্রমাগত উপরের দিকে উঠিতেছে, অন্যটির ধাপগুলি নীচের দিকে নামিতেছে। প্রথম ধাপটিতে পা রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেই ঘুরন্ত সিঁড়ি তোমাকে নীচে বা উপরে লইয়া যাইবে।

প্ল্যাট্‌ফরমে বসিবার জন্য বেঞ্চ পাতা রহিয়াছে। কিন্তু কোন ষ্টেশনেই যাত্রীদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিবার আবশ্যক হয় না। কারণ, কয়েক মিনিট পরপরই ট্রেন আসিতেছে ও যাইতেছে। প্রসিদ্ধ

খেলা বা উৎসবাদি উপলক্ষে কোন কোন পথে ঘণ্টায় চল্লিশখানি অর্থাৎ দেড় মিনিট পর পরই এক একখানা ট্রেন চলিয়া থাকে। এক একদিকে দুইটি করিয়া সুড়ঙ্গ, যে পথে গাড়ী যায়, সে পথে আর ফিরে না, ফিরে অন্য পথ দিয়া। বিভিন্ন দিকের জন্য এক এক ষ্টেশনে প্ল্যাট্‌ফরমও বিভিন্ন। প্ল্যাট্‌ফরমে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইতেই উহার দরজাগুলি আপনা হইতেই দুইদিকে সরিয়া যায়। ভিতরের যাত্রীরা নামিতে না নামিতেই বাহিরের যাত্রীদিগকে গাড়ীতে উঠিতে হয়, কেন না, নির্দ্দিষ্ট সময় পরেই দরজাগুলি বন্ধ হইয়া যায়। অনেক সময় হয় ত কোন অসাবধান ও মন্থরগতি যাত্রী উঠা-নামা করিবার কালে গাড়ীর দরজার ফাঁকে আবদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু তাহাতে বিপদ্ তেমন ঘটে না; কারণ কোন-কিছুতে বাধা পাইলেই দরজার গতি বন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং আবদ্ধ মানুষটির গায়ে তত চাপ লাগিতে পারে না।

তিন হইতে ছয়টি গাড়ী জুড়িয়া এক-একটি ট্রেন করা হয়। ট্রেনে কর্ম্মচারী মাত্র দুইজন; একজন ড্রাইভার, অন্যজন গার্ড। ড্রাইভার ট্রেনের অগ্রভাগে থাকিয়া বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে গাড়ীর গতি পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করে। গাড়ীর দরজা খোলা ও বন্ধ করাও তাহারই ইচ্ছানুসারে হয়। ড্রাইভারের সঙ্গে একটি টেলিফোন-যন্ত্র থাকে; ষ্টেশন হইতে দূরবর্ত্তী কোন স্থানে কল বিগড়াইয়া হঠাৎ গাড়ী থামিয়া গেলে বা অন্য কোন বিপদ ঘটিলে, টেলিফোনের সাহায্যে সে কর্ত্তৃপক্ষকে সংবাদ দেয়। কিন্তু এরূপ আকস্মিক বিপদ্ বা অসাধারণ কিছু কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে।

সুড়ঙ্গ-পথের টিকেট দেখাইতে হয়, নীচে নামিবার সময় বা উপরে উঠিবার কালে। প্ল্যাট্‌ফরমে বা ট্রেনে কেহ টিকেট দেখিতে চায় না। সুতরাং গন্তব্য ষ্টেশন ছাড়াইয়া ভ্রমে বা ইচ্ছাক্রমে অনেক দূর চলিয়া গেলেও ঘুরিয়া-ফিরিয়া সেই

ষ্টেশন দিয়া উপরে উঠিলে অতিরিক্ত মাশুল দিতে হয় না ; অতিরিক্ত মাশুল আদায় করিবার উপায়ও থাকে না।

বিদ্যুতের সাহায্যে গাড়ীগুলি খুব দ্রুতই চলে। তবে অল্প দূরে দূরে ষ্টেশন থাকাতে ইহাদের গতি ঘণ্টায় গড়ে ২৫ মাইলের অধিক হয় না। লণ্ডনের টিউব্-রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৯১ মাইল ; ইহার ৬২ মাইল সুড়ঙ্গের ভিতরে, বাকীটা মুক্ত স্থান দিয়া গিয়াছে। ইহার ষ্টেশনের সংখ্যা ১৯৪, গাড়ীর সংখ্যা ২০০০ এবং ইহাতে লোক চলাচল করে দৈনিক বিশ লক্ষের উপর ! মানুষের দৃষ্টি যদি মাটি ভেদ করিয়া চলিতে পারিত, তবে উপর হইতে দেখা যাইত, ভোর পাঁচটা হইতে রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত লণ্ডন শহরের নীচ দিয়া টিউব্-রেলের ট্রেনগুলি দ্রুতগতিতে কেঁচোর মত এদিক ওদিক ছুটিয়া চলিয়াছে।

এই সুড়ঙ্গ-পথ বর্ত্তমান যুদ্ধের বিমানহানা হইতে আত্মরক্ষার্থ আশ্রয়স্থলরূপেও ব্যবহৃত হইতেছে।

যখন শত্রুরা বিমান হইতে অতি—বিস্ফোরক বোমা নিক্ষেপ করিয়া সমস্ত নগরী ধ্বংস করিতে থাকে, তখন এই সুড়ঙ্গ-পথে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বহুলোক তাহাদের জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

লণ্ডন নগরী টেমস্ নদীর তীরে অবস্থিত, তাহা তোমরা জান। লণ্ডনের পাতালপথের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, টেমস্এর তলদেশ দিয়া রেলপথ অপর পারেও গিয়াছে। এই নদীর জলের উপর দিয়া চলে জাহাজ, আর তলার মাটি ভেদ করিয়া চলে ট্রেন!

"উপরে জাহাজ চলে, নীচে চলে নর,"

বাস্তবিকই আশ্চর্য্য নয় কি?

দুর্ভিক্ষ-বিজয়

প্লাবন, ঝড়-ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণাবর্ত্ত, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের কাছে মানুষ শিশুর মত অসহায়। অবস্থা-বিশেষে প্রকৃতির হাতে সে সামান্য ক্রীড়নক মাত্র। কিন্তু মানুষ জড়পদার্থ নহে; সে প্রাণী। তাহার বুদ্ধি আছে, উদ্যম আছে, সাহস আছে। তাই যুগের পর যুগ সে প্রাকৃতিক বাধা-বিপত্তি লঙ্ঘন করিয়া জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া চলিয়াছে, নানা প্রতিকূল অবস্থাকে অনুকূল করিয়া তুলিয়া নিজের জীবনযাত্রা সরল ও সুখময় করিয়া লইতেছে।

বুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তি-বলে মানুষ একদিকে বন-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া লোকালয় স্থাপন করিয়াছে, অন্যদিকে জল-সেচের ব্যবস্থা দ্বারা ঊষর মরুভূমিকে শস্য-শামল করিয়া তুলিবার আয়োজন করিতেছে। অবশ্য সাহারার বুকে কুসুম ফুটান আজিও সম্ভব হয় নাই, কিন্তু মানুষেরই বুদ্ধি-কৌশলে আজ মিশর বন্যা আর দুর্ভিক্ষের অত্যাচার হইতে মুক্ত, ভারতের লোকালয়হীন মরুময় সিন্ধু প্রদেশ এখন ধন-জন পূর্ণ গ্রাম-জনপদে সুশোভিত। অনুর্ব্বর পাঞ্জাব প্রদেশ জলসেচের ফলে বর্ত্তমানে পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ গম উৎপাদনের স্থান।

ভারতের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত পাঞ্জাব ও সিন্ধু—দুইটি প্রদেশের অধিকাংশ স্থানই প্রায় সমতল। প্রসিদ্ধ সিন্ধুনদ ও উহার উপনদী সমূহের জলধারায় সিক্ত হইলেও বারিপাতের অল্পতা-হেতু এই দুই দেশে শস্যাদি অতি সামান্যই জন্মিত। খাদ্যশস্য যেখানে অপ্রচুর, লোকসংখ্যা সেখানে

বিরল। সুতরাং কৃষি-সম্পদে ও জনবলে সিন্ধু এবং পাঞ্জাব ছিল অন্যতম নগণ্য স্থান। সেই নগণ্য স্থানের নিরন্ন যাযাবর জাতি কেমন করিয়া সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ হইয়া উঠিয়াছে, সেই কথাই এখানে বলিব।

কৃষিকার্য্যের জন্য জলের একান্ত প্রয়োজন। সেই জল পাইবার প্রধান উপায় নদী ও বৃষ্টি। নানা প্রাকৃতিক কারণে সিন্ধু ও পাঞ্জাব প্রদেশে বৃষ্টিপাত নিতান্ত অল্প। নিজের ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুসারে আকাশের অশান্ত মেঘের উপর এখনও মানুষ কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিতে পারে নাই। অসীমের বারিধারাকে বশে আনিয়া নিজ প্রয়োজন সাধন করিবার চেষ্টা মানুষ করিতেছে হয় ত, কিন্তু মানুষের সে চেষ্টাকে প্রকৃতি আজ পর্য্যন্ত উপহাস করিয়াই চলিয়াছে। তবে জলের যে-ধারা ধরার বুকে বাঁধা পড়িয়াছে, তাহাকে মানুষ অসংখ্য প্রয়োজনে খাটাইয়া প্রকৃতির সেই পরিহাসের প্রতিশোধ লইতেছে। সিন্ধু ও উহার পাঁচটি

উপনদী হইতে খাল কাটিয়া প্রায় সমগ্র পাঞ্জাবে জল সেচনের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। সেই সকল কৃত্রিম খাল হইতে অপরিসর নালা কাটিয়া কৃষকেরা নিজ নিজ জমিতে জল লইয়া যায়। সুতরাং তাহাদিগকে আর একমাত্র বৃষ্টির উপর নির্ভর করিতে হয় না।

নদী যেখানে বেগবতী, সেখানেই খালের সাহায্যে জল অনেক দূরে যায়। কিন্তু স্রোত যেখানে মৃদু, সেখানে নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া বাঁধের উজানের জলের চাপ বাড়াইয়া লইতে হয়। সম্প্রতি পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশের সীমায় অবস্থিত সুক্কুর নামক স্থানে সিন্ধুনদে একটি বিরাট বাঁধ প্রস্তুত করিয়া মানুষ নিজ কর্ম্মশক্তির পরিচয় দিয়াছে। কৃষিক্ষেত্রে জল সেচনের জন্য এরূপ প্রকাণ্ড বাঁধ পৃথিবীর আর কোথাও নাই। উহার নাম হইয়াছে সুক্কুর বাঁধ বা লয়েড বাঁধ (Lloyd Barrage). সেই বাঁধের কল্যাণে ভারত হইতে

সুক্কুর বাঁধ বা লয়েড বাঁধ (Lloyd Barrage)—পৃঃ ৬২

দুর্ভিক্ষ প্রায় লোপ পাইয়াছে। দৈব-দুর্ব্বিপাকে কোনও বৎসর লোকের অনটন হইতে পারে, কিন্তু "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" পুনরায় ঘটিতে পারিবে না—নিশ্চয়।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ করিয়া শত শত লোকের নয় বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর, গত ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে লয়েড বাঁধের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইয়াছে। এই বাঁধের দৈর্ঘ্য এক মাইল, অর্থাৎ টেমস্ নদীর উপরিস্থিত সুবিখ্যাত লণ্ডন-সেতুর প্রায় পাঁচ গুণ। বাঁধের যে অংশ শুধু নদীর মধ্যে তাহাতে ৬৬টি খিলান। প্রত্যেকটি খিলান ৬০ ফুট লম্বা। এক একটি খিলানের নীচে এক একটি করিয়া লোহার দরজা ও কপাট। তাহাদের সাহায্যে জলের গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া ৭০ লক্ষ একর জমি কৃষির উপযোগী করা হইয়াছে। এই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডকে জলসিক্ত করিবার জন্য যে সকল খাল ও নালা খনন করা হইয়াছে, উহাদের মোট দৈর্ঘ্য ছয় শত মাইলের

উপর ! বাঁধ নির্ম্মাণ ও খাল খনন করা ইত্যাদি কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় হইয়াছে প্রায় বিশ কোটী টাকা। উপকৃত প্রজাদের উপর বার্ষিক সামান্য কর ধার্য্য করিয়া গবর্ণমেণ্ট এই টাকা আদায় করিয়া লইতেছেন। জলসিক্ত জমিতে প্রতি বৎসর গম, বার্লি, কার্পাস, ধান্য প্রভৃতি যে সকল ফসল উৎপন্ন হয়, তাহার মূল্য প্রায় ত্রিশ কোটী টাকা। পূর্ব্বে যেখানে ছিল তরুলতার চিহ্ন বিহীন বালুকাময় মরুভূমি, আজ সেখানে গড়িয়া উঠিয়াছে তাজা সবুজ শস্যভরা চোখ-জুড়ান মাঠ ! পূর্ব্বে যেখানে জনমানবের লেশ ছিল না, সেখানে আজ হইয়াছে লক্ষ লক্ষ লোকের বাস, কত বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম, কত শ্রীসম্পন্ন নগর !

মিশরের অধিকাংশ স্থানই অনুর্ব্বর ও মরুময় ; কৃষির উপযোগী অংশেও বৃষ্টিপাত তেমন হয় না। বৃষ্টিপাত যেন সে দেশে একটি আকস্মিক ঘটনা ; কোথাও কোনও দিন সামান্য বারিপাত হইলে

সে-কথা বড় বড় অক্ষরে খবরের কাগজে ছাপা হয়!

মিশরের যে অংশ নীলনদের প্লাবনে সিক্ত হয়, তথায় প্রচুর শস্য জন্মিয়া থাকে; কিন্তু বন্যা-প্লাবিত অংশের পরিমাণ সমগ্র দেশের তুলনায় অতি সামান্য, আর সেই অংশে কৃষির কাজ করিতে হয় অতি সাবধানে। এক বন্যা শেষ হইতে না হইতেই ভূমি-চাষ ও বীজবপন ইত্যাদি সমাধা করিয়া পুনরায় বন্যা আসিবার আগেই শস্য সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়। আবার নীলনদের প্লাবন-সীমাও প্রতি বৎসর সমান থাকে না। যে-বারে জলের স্ফীতি নিতান্ত কম, সে-বারে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য; আর যে-বার জল-বৃদ্ধি মাত্রা ছাড়াইয়া যায়, সে-বার শস্যনাশ অবশ্যম্ভাবী!

কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য মিশরের প্রাচীন সম্রাট্ ফেরোয়াগণও নীলনদ হইতে খাল কাটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানের তুলনায়

সে সময়ে মানুষের যান্ত্রিক সম্পদ্ ছিল নিতান্ত অপ্রচুর ; বিজ্ঞানের তখন শৈশব মাত্র। দৈহিক শক্তির বলে অতিকায় পিরামিড নির্ম্মাণ সম্ভবপর হইয়াছিল, কিন্তু নীলের গতিরোধ করিতে গেলে হয়ত মারাত্মক ব্যাপার হইত। সেকালের খেয়ালী নীল, মানুষের কৌশলে একালে মিশরের প্রাণ-প্রবাহ।

নীলনদে সবশুদ্ধ চারিটি বাঁধ। ইহাদের মধ্যে আসোয়ানের বাঁধটি (Assuan Dam) বিশেষ প্রসিদ্ধ এবং সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। নীলের মোহনা হইতে ৭৫০ মাইল দূরে এই বাঁধটি ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম নির্ম্মিত হয়। ইহার দৈর্ঘ্য নদীর এক পার হইতে অপর পার পর্য্যন্ত প্রায় সওয়া মাইল, ভিত্তি হইতে উচ্চতা ১২০ ফুট এবং তাহাতে কপাটের সংখ্যা ১৮০। বাঁধটি প্রস্তুত হইবার কয়েক বৎসরের মধ্যেই উহাকে আরও উঁচু করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং ১৯০৭

খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় কাজ আরম্ভ করিয়া পাঁচ বৎসরের মধ্যে উহার উচ্চতা ২৩ ফুট বৃদ্ধি করা হয়।

মিশরীয়েরা দেখিল, বাঁধ যত উঁচু হয়, উহার উজানে জল তত বেশি জমে এবং কাটান খালের ভিতর দিয়া তত অধিক দূরে জল সরবরাহ করা সম্ভবপর হয়। সুতরাং আসোয়ানের বাঁধকে তাহারা দ্বিতীয়বার উচ্চতর করিবার সংকল্প করিল। স্থির হইল, এবারে ইহাকে আরও ৩০ ফুট উঁচু করা হইবে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে সুরু করিয়া ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এই কাজ শেষ হইয়াছে। আসোয়ান বাঁধের মোট উচ্চতা এখন ১৭৩ ফুট, উহার উজানে জল জমিয়া যে হ্রদের সৃষ্টি করে, তাহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৩০ মাইল।

নীলের জলকে কাজে লাগাইয়া মিশরদেশ বৃষ্টিহীন হইয়াও আজ শস্যশালী—মরু-বাসী হইয়াও মিশরীয়েরা দুর্ভিক্ষ-জয়ী।

ভারতের লয়েড বাঁধ ও মিশরের আসোয়ান বাঁধ খুবই বিখ্যাত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু

এইগুলি ছাড়া আরও বহু বাঁধ আমাদের ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে রহিয়াছে।

দক্ষিণ ভারতের মেত্তুর বাঁধ (Mettur Dam) ইন্‌জিনিয়ারদিগের একটি উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি। কাবেরী নদীর উৎপত্তিস্থান হইতে ২৪০ মাইল দূরে, নদীর পার্ব্বত্য অংশে, বাঁধটি প্রস্তুত করা হইয়াছে। বাঁধের মোট দৈর্ঘ্য এক মাইলের উপর। উহা দ্বারা তাঞ্জোর ও ত্রিচিনপল্লী অঞ্চলে, অর্থাৎ বাঁধ হইতে প্রায় ১২৫ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে, জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুক্কুর বাঁধের ন্যায় মেত্তুর বাঁধ প্রস্তুত করিতেও সময় লাগিয়াছে নয় বৎসর। মেত্তুর বাঁধের নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা উপলক্ষে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে আগষ্ট তারিখে বিরাট এক অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল।

পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য বাঁধ হুভার ড্যাম (Hoover Dam). আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের প্রেসিডেণ্টের নামানুসারে ইহার নাম রাখা হইয়াছে।

উত্তর আমেরিকার কলোরেডো নদীর কথা সকলে শুনিয়া থাকিবে। উহার মত অদ্ভুত নদী পৃথিবীতে আর নাই। জলের তোড়ে পাহাড়ের ভিতর দিয়া বিরাট গিরিখাত বা ক্যানিয়ন (canyon) প্রস্তুত করিয়া নদীটি ক্যালিফোর্ণিয়া উপসাগরে পড়িতেছে। শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, স্থানে স্থানে এই নদীর জলধারা উহার দুই তীর হইতে প্রায় এক মাইল নীচে অর্থাৎ তীরে দাঁড়াইয়া নীচের দিকে চাহিলে দেখা যায়, যেন একটি সরু রূপালী রেখা আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে!

কলোরেডো নদীর তীর যেখানে প্রায় আধ মাইল উঁচু, স্রোতের বেগ সেখানে ঘণ্টায় ৩০ মাইল; দুঃসাহসী মানুষ সেইখানেই একটি বাঁধ প্রস্তুত করিতেছে। বাঁধটির দৈর্ঘ্য হইবে মাত্র ১১৮০ ফুট, কিন্তু উহার উচ্চতা হইবে ৭৩০ ফুট। জলের প্রচণ্ড বেগ সামলাইবার জন্য বাঁধের তলা

৬৫০ ফুট চওড়া করিয়া, ক্রমশঃ চাপা করিতে করিতে উপরে মাত্র ৪৫ ফুট রাখা হইবে !

হুভার বাঁধ দ্বারা জল আট্‌কাইলে যে হ্রদের সৃষ্টি হইবে, উহা লম্বায় হইবে প্রায় ১১৫ মাইল এবং কোন কোন স্থানে উহা চওড়া হইবে ৮ মাইল। সেই হ্রদ হইতে বড় বড় নদীর মত খাল কাটিয়া কালিফোর্ণিয়ার মরু অঞ্চলে লইয়া যাওয়া হইবে এবং প্রায় পাঁচ লক্ষ একর ভূমিকে শস্যশালিনী করা হইবে। জলের শক্তিতে কল চালাইয়া বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হইবে এবং তাহা ক্যালিফোর্ণিয়া, এরিজোনা, নেভেডা প্রভৃতি অঞ্চলের সহরগুলিকে যোগান হইবে। পাহাড়-পর্ব্বত, বনজঙ্গল ও মরুভূমির ভিতর দিয়া ২৬৫ মাইল দীর্ঘ নালা কাটিয়া "চিত্র-নগরী" লস্‌এঞ্জেলিসে পানীয় জল প্রেরণ করা হইবে।

ক্ষেত চুরি

গহনা চুরি, টাকা-পয়সা চুরি—বড় জোর ছেলে চুরির কথা তোমরা শুনিয়াছ। কিন্তু এক কৃষক আর এক কৃষকের ক্ষেত চুরি করিয়া নিয়া যায়, এমন অদ্ভুত কথা কখনও শুনিয়াছ কি? যদি বলি যে, যে-দেশে এরূপ আজগুবী কাণ্ড ঘটে, সে-দেশ স্বর্গেও নয়, পাতালেও নয়—সে-দেশ আমাদের ভারতবর্ষেরই সীমার মধ্যে, তাহা হইলে হয়ত তোমাদের বিস্ময়ের আর অবধিই থাকিবে না।

আমাদের বাঙ্গালা দেশ হইতে বায়ু-কোণে—পাহাড়-ঘেরা, গাছে ঢাকা পরম সুন্দর কাশ্মীর দেশ। সেই দেশের তুষারমাখা পাহাড়-চূড়ার মাঝে মাঝে সবুজ গাছপালা-ছাওয়া উঁচুনীচু মাঠ,—

মাঠের বুক চিরিয়া চলিয়াছে রূপালী জলধারা। মাঠের এক পাশে, পাহাড়ের কোল ঘেঁসিয়া রহিয়াছে সুদৃশ্য হ্রদ। নানা জাতীয় তরুলতা আর ফলফুলে পরিশোভিত কাশ্মীর দেশ যেন প্রকৃতির নিজহাতে রচিত একটি বিলাস-কানন। স্বর্গের সৌন্দর্য্যের সহিত কাশ্মীরের প্রকৃতির শোভার তুলনা করিয়া কবিরা এইদেশের নাম দিয়াছেন 'ভূ-স্বর্গ'। সত্য কথা বলিতে কি, কাশ্মীর দেশের তুলনা এই পৃথিবীতে নাই।

কাশ্মীর দেশের পরিচয় একরকম দেওয়া হইল। এখন, সেই দেশে ক্ষেত চুরি কি করিয়া হয়, তাহা বলি।—

কাশ্মীরের হ্রদগুলির মধ্যে উলার আর ডাল হ্রদের নামই বেশি প্রসিদ্ধ। ডাল হ্রদের জল একেবারে স্থির; এজন্য সে হ্রদে অসংখ্য জলজ লতাগুল্ম জন্মে। ইহার কোন কোন জায়গায় এইসব লতাপাতা এত ঘন হয় যে, উহাদের মধ্যে

বিন্দুমাত্র ফাঁক ত থাকেই না, বরং একটির সহিত আর একটি জড়াইয়া গিয়া এমনই পুরু হইয়া ভাসিতে থাকে যে, উপর দিয়া মানুষ বা গরু-বাছুর ছুটাছুটি করিলেও ডুবিয়া যাওয়ার কোনই আশঙ্কা থাকে না। এজন্য সেইগুলিকে ভাসমান ক্ষেত বলা চলে। জলের নীচের পাঁক হইতে যে সব লতা জন্মে, কৃষকেরা সেগুলি কাটিয়া দিয়া মাটির বাঁধন হইতে ক্ষেতগুলিকে আল্‌গা করিয়া দেয়। তারপর সেগুলির উপর কিছু ঘাস-পাতা ও সামান্য মাটি ছড়াইয়া রাখে। এমনি করিয়া ক্ষেতগুলির উপর লতা-পাতা আর মাটির স্তর ফেলিতে ফেলিতে সেগুলি বেশ পুরু হইয়া উঠে। সকলের শেষে কিছু বেশি পরিমাণ মাটি ছড়াইয়া দিয়া ক্ষেতগুলিকে চাষের উপযোগী করিয়া তোলা হয়। ইহার পর হাল জুড়িয়া দিয়া চাষ করিয়া আসিলেই হইল!

সময় সময় এক একজন দুষ্ট কৃষক অপরের ক্ষেত সরাইয়া নিয়া নিজের ক্ষেতের সহিত এমনি

বেমালুম লাগাইয়া দেয় যে, জোড়ার চিহ্নই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এইরূপ ক্ষেত চুরির নালিশ রাজদরবারে প্রায়ই হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে গরু-বাছুর, মোটর-কার, ছোট ছোট নৌকা—এইসব জিনিস মোকদ্দমা সম্পর্কে কাছারীতে উপস্থিত করিতে দেখা যায়। কাশ্মীরে কিন্তু ক্ষেত পর্য্যন্ত বহিয়া নিয়া আদালতে হাজির করা হয়,—অবশ্য ক্ষেতখানা যদি খুব ছোট হয়। এমন মজার কথা তোমরা নিশ্চয়ই শোন নাই।

বিতস্তা নদীর তীরে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর অর্থাৎ সুন্দর সহর। শুধু নামেই সুন্দর নয়— শ্রীনগর বাস্তবিকই সৌন্দর্য্যের আধার এবং এই কারণেই দিল্লীর মোগল বাদশাহেরা গ্রীষ্মকালে সেখানে গিয়া বাস করিতেন।

শ্রীনগর হইতে অল্প দূরে হাকেরসর নামে একটি হ্রদ আছে। সেই হ্রদে বেশ বড় রকমের কয়েকটি ভাসমান দ্বীপ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল

শ্রীনগর —পৃঃ ৭৪
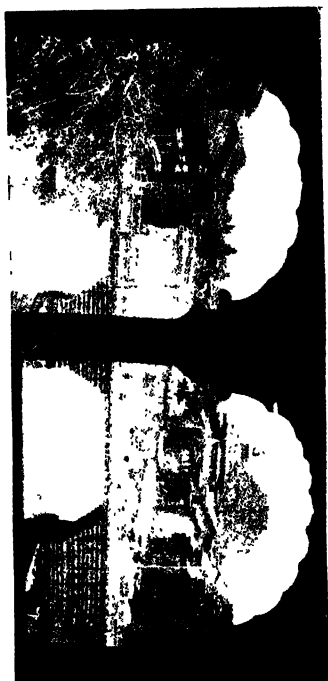
দ্বীপে গোচারণের তৃণভূমি, শস্যের ক্ষেত, ঝোপঝাড় ত আছেই, তাহা ছাড়া নানা রকমের বড় বড় গাছও সেখানে অনেক জন্মিয়া থাকে। সেই সব গাছে ফুল ফোটে, ফল ধরে, পাখীরা বাসা বোনে। এক সময় হয়ত কৃষকেরা মাঠে কাজ করিতেছে, পশুরা চরিয়া বেড়াইতেছে,—এমনি সময় বাতাস একটু জোরে বহিতে সুরু করিল, আর অমনি মাঠ-ঘাট, গাছপালা, পশুপাখী, মানুষ-জনশুদ্ধ ক্ষেতগুলি ধীরে ধীরে একদিকে ভাসিয়া চলিল।—কেমন আশ্চর্য্য দৃশ্য !

কাশ্মীরের আবহাওয়াও ভারী চমৎকার। সে-দেশের লোকেরা গর্ব্ব করিয়া বলিয়া থাকে যে,—ভাজা মাছও যদি কাশ্মীরে আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে সে এখানকার আবহাওয়ার গুণে বাঁচিয়া উঠিয়া লাফাইয়া গিয়া জলে পড়িবে। ভাজা মাছ আর সত্যি সত্যি বাঁচিয়া উঠে না বটে, কিন্তু ওদেশের আবহাওয়ার কেরামৎ আছে নিশ্চয়। কাশ্মীরীদের গোলাপী রং আর গোলগাল বলিষ্ঠ চেহারা দেখিলেই

তাহা বেশ বোঝা যায়। কাশ্মীরের লোকেরা যে খুবই সুন্দর তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদের মত নোংড়া মানুষও বুঝি পৃথিবীর আর কোথাও নাই। স্নান ত তাহারা রীতিমত করেই না, তাহাদের কাপড়-চোপড়ের সহিত জল আর সাবান-সোডার সাক্ষাৎ কোন কালে হয় কিনা সন্দেহ! কিন্তু দেশের উত্তম জলবায়ুর গুণে তাহাদের অসুখ-বিসুখ খুব কমই হয়।

কাশ্মীরের মেওয়ার কথা বেশি বলিয়া তোমাদের লোভ বাড়াইতে চাই না। যদি কখনও সেই দেশে যাও তবে দেখিতে পাইবে, যেখানে সেখানে পেস্তা, বাদাম, আপেল, নাস্‌পাতি, আখ্‌রোট প্রভৃতি ফল গাছে গাছে সাজান রহিয়াছে। মাঠে, ঘাটে, গাঢ় সবুজ আঙুর-লতায় থোবা থোবা আঙুর ঝুলিতেছে; যত ইচ্ছা খাইতে পার, কেহই নিষেধ করিবে না।

শেষ